আজব জীবজগৎ

ওয়াল্টার রথশিল্ডের গল্প ও তাঁর মিউজিয়াম

লিটা জাজ

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী

ওয়াল্টার রথশিল্ড ছোট থেকেই অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন। তিনি এক বিখ্যাত ব্যাঙ্কারের পরিবারে জন্মেছিলেন। তিনি পৃথিবীর অন্যতম ধনী পরিবারে জন্মেছিলেন। কিন্তু সেটা তার অভিনবত্বের কারণ ছিল না। ওয়াল্টার ছোট থেকেই এত চুপচাপ ছিলেন যে তাঁর কোন বন্ধু ছিল না। তিনি প্রানীদের ভীষণ ভালবাসতেন, বিশেষত ছোট প্রানী যারা জমিতে কিলবিল করে, গুটি গুটি পায়ে চলে কিম্বা উড়তে পারে।

সাত বছর বয়সে ওয়াল্টার প্রথম সার্কাস প্যারেড দেখেছিলেন। তা দেখে তিনি এত অভিভুত হয়েছিলেন যে তিনি তাঁর বাবা মাকে বলেছিলেনঃ " আমি পৃথিবীর সব জায়গা থেকে প্রানীদের নিয়ে এসে একটা মিউজিয়াম বানাব।" সেই লক্ষ্যে খুব তাড়াতাড়ি ওয়াল্টার কিনে এনেছিলেন ক্যাঙ্গারু, ওয়ালাবি, এবং কিউই। এতেই তিনি থেমে থাকেন নি। একদিন এমন অবস্থা হয় যে রথশিল্ড এস্টেটের বিশাল জমি তার নিয়ে আসা প্রানীদের জন্য কম পড়তে শুরু করে। যখন ওয়াল্টারের এক গোসাপ তাঁর মায়ের সাধের লিলি ফুল খেতে থাকে, তাঁর মা ও সেদিন ভীষণ রেগে ওঠেন। লর্ড রথশিল্ড মনে করেছিলেন তাঁর ছেলেই ধীরে ধীরে তাঁদের ব্যবসার হাল ধরবে। কিন্তু তাতে বাধ সাধে ওয়াল্টারের স্বপ্ন।

এক লাজুক ছেলে তার স্বপ্নকে স্বাকার করার জন্য কি অধ্যাবসায়ের সাথে নিজেকে এক অভিনব বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন ও বিবিধ রকমের প্রানীদের সম্বন্ধে কিভাবে পৃথিবীর ধ্যান ধারণাই বদলে দিলেন তা সত্যই অভাবনীয়।

এমা ও লর্ড রথশিল্ডের ছেলে ওয়াল্টার সকলের থেকে আলাদা ছিল। ১৮৬৮ সালে তিনি লন্ডনের পাশেই এক এস্টেটে জন্মেছিলেন। সেখানে তাদের বিশাল প্রাসাদপ্রমাণ বাড়ি ও বিরাট বাগিচা তাঁর কাছে তাঁর ছোট পৃথিবীর মত ছিল- সেখানে জানার ও শেখার মত প্রচুর জিনিস ছিল। সেখানে বিভিন্ন রকমের ক্যাকটাসের জন্য একটা গ্রীন হাউস ছিল, আরেকটা গ্রীন হাউস ছিল নানান রকমের অর্কিডের জন্য, এবং তৃতীয়টি ছিল শুধু ইংল্যান্ডের রানীর জন্য বিশেষ করে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে নানান ধরনের ফুল ফোটানোর জন্য। ওয়াল্টারের বাবা রানীর ব্যাঙ্কার ছিলেন। ওয়াল্টারের পরিবারের সবাই একেক ব্যাঙ্কের মালিক ছিলেন। ওয়াল্টার ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম ধনী পরিবারের একজন। কিন্তু সেটা তার অভিনবত্বের একমাত্র কারণ ছিল না।

ওয়াল্টার এত লাজুক ছিলেন যে তিনি ছোট থেকেই খুবই কম কথা বলতেন। তাঁর বাবা মার ভয় ছিল যে অন্য বাচ্চারা স্কুলে না ওয়াল্টারকে নিয়ে মজা করে। তাই তাঁরা ওয়াল্টারকে বাড়িতে রেখেই এক শিক্ষিকাকে দিয়ে পড়ানোর ও তাঁর দেখাশোনার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু ওয়াল্টার কথা না বলে সারাদিন পোকা মাকড়, পাখী, আর বিভিন্ন প্রানী সংগ্রহ করে বেড়াতেন। প্রজাপতি খোঁজার জন্য তাঁর কোন বিশেষ করে পড়াশোনার বা শব্দ শেখার দরকার ছিল না। ওয়াল্টারের কোন বন্ধু ছিল না, কিন্তু তিনি সব ছোট ছোট জীবজন্তুদের খুব ভালবাসতেন, বিশেষত যারা জমির উপর পায়ে না হেঁটে চলে বা ওড়ে।
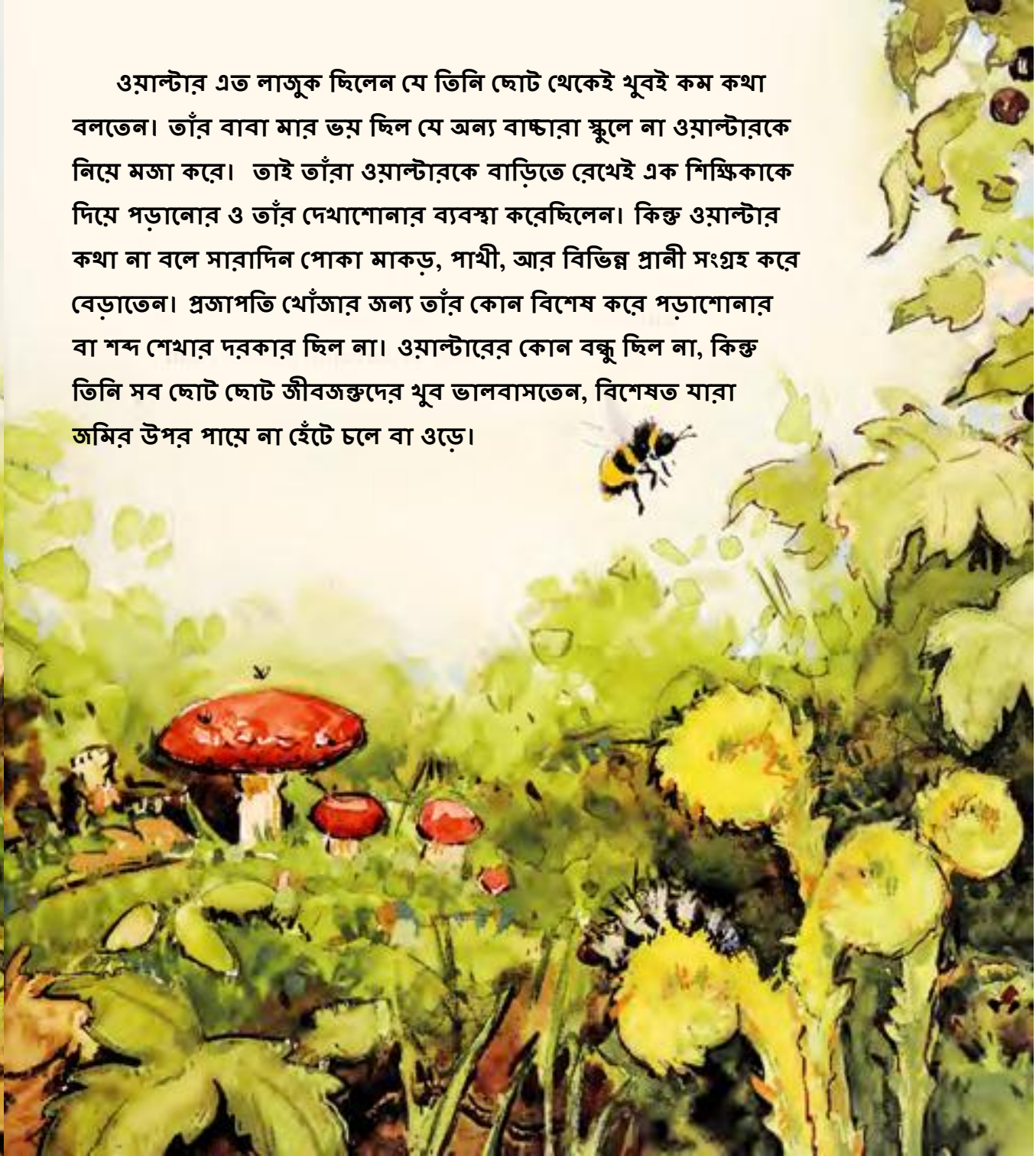
এক সন্ধেবেলা, তাঁর বাবা দুঃখ করে বললেন, “রথশিল্ডের ছেলের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না! তোমাকে কথা বলা শিখতে হবে। “

যখন তাঁর বাবা তাঁকে বকছিলেন, ওয়াল্টারের নিজেকে একটা শামুকের মত মনে হচ্ছিল– ছোট, অসহায় এবং খোলার মধ্যে কুঁকড়ে ঢুকে যাওয়া এক শামুক।

পরদিন তিনি দূর থেকে শুনলেন তাঁর মা আর বাবা তাঁকে নিয়ে আলোচনা করছেন।

"ও তো এখনো কিছুই শেখে নি!" বাবা বললেন।

"ও খুব একা," মা বাধা দিলেন. “ও ঠিক একদিন এর থেকে বেড়িয়ে আসবে। কথা বলবে।"

বাবা ব্যস্তভাবে জোড়ে জোড়ে পায়চারি করতে লাগলেন, "ও কোনোদিন আমাদের পারিবারিক ব্যবসা সামলাতে পারবে না। ও কিস্যু করতে পারবে না জীবনে।"
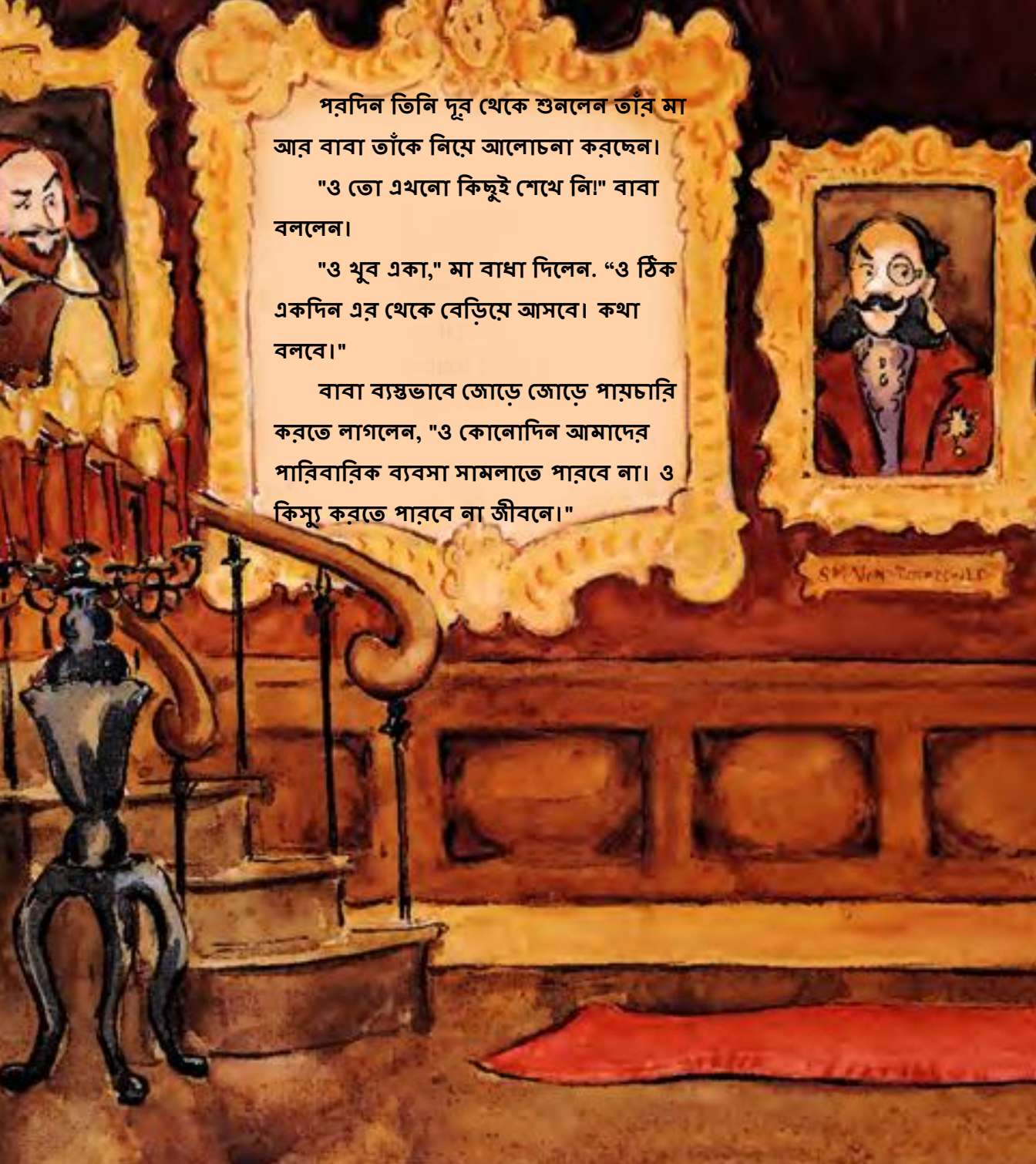
ওয়াল্টারের চিন্তা হল হয়ত তাঁর বাবা ঠিকই ভাবছেন।

যিনি তাঁকে দেখাশোনা করতেন ও পড়াতেন, তিনি একদিন ওয়াল্টারকে পিকাডেলিতে এক সার্কাস দেখাতে নিয়ে গেলেন। ওয়াল্টার প্রথমবার সেখানে বাঁদর, জেব্রা, আর উট দেখলেন। তিনি তাদের দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি লাফাতে শুরু করলেন। তাঁর পা উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল, আর শব্দরা ভীড় করতে লাগল তাঁর মাথায়।
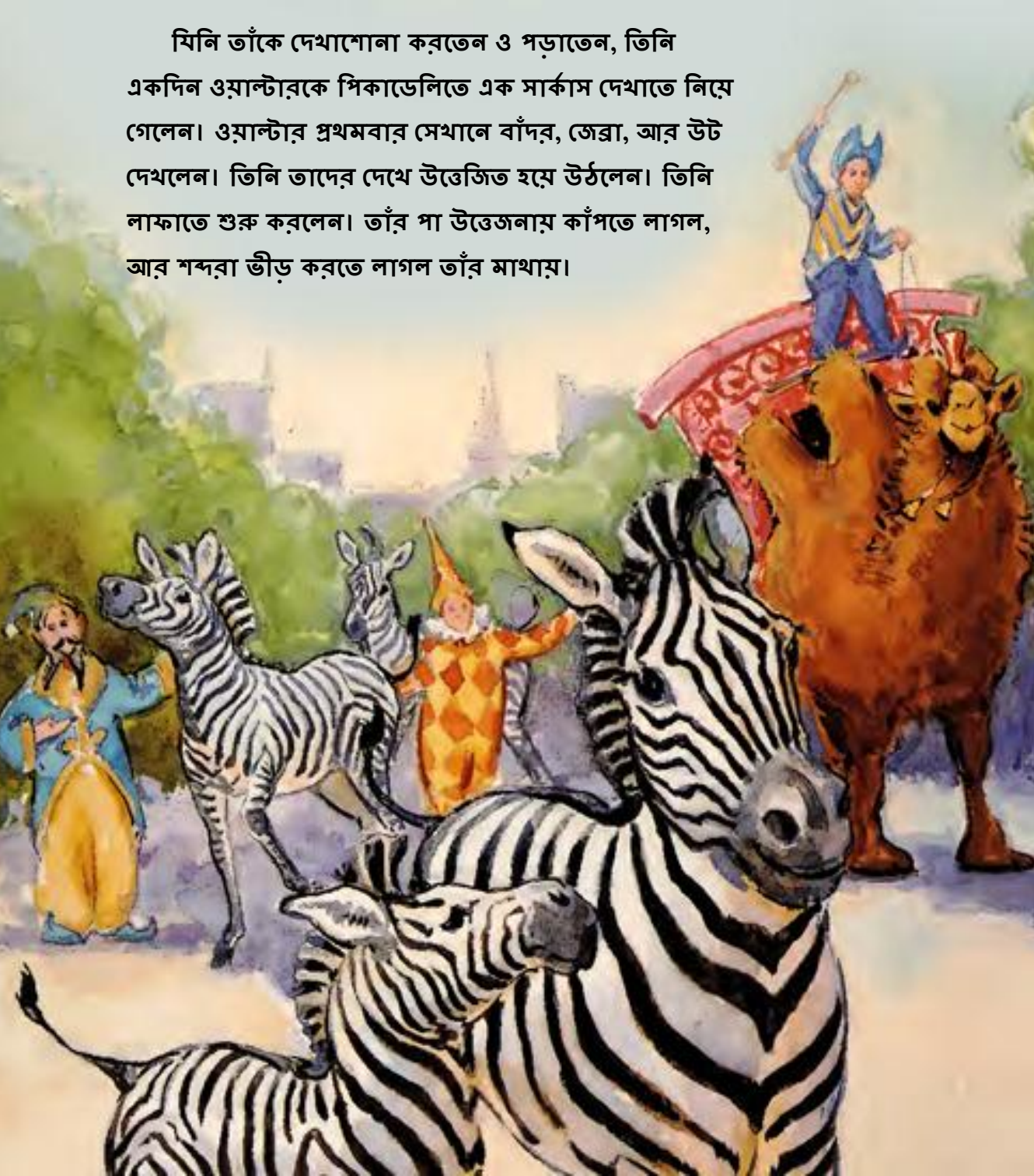
যখন তিনি বাড়ি ফিরলেন, তিনি উল্লাসে ফেটে পড়লেন, “মা, বাবা, আমি পৃথিবীর সব জায়গা থেকে প্রাণী সংগ্রহ করে একটা মিউজিয়াম বানাতে চাই। আর সেটাকে আমি আমার নাম দিতে চাই।“ এক নিঃশ্বাসে তিনি বললেন।

এবার তাঁর বাবার কিছু বলার ছিল না।

ওয়াল্টার মাত্র সাত বছরের ছিলেন, কিন্তু তিনি তখন থেকেই তাঁর মিউজিয়াম নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি কল্পনা করেছিলেন এমন এক মিউজিয়াম যেখানে ঐতিহাসিক জিনিসের সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবন্ত প্রানীরাও থাকবে। ওয়াল্টার পরিবার এর জন্য পৃথিবীর সেরা প্রাণীবিদদের নিয়োগ করলেন যাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানান জীব জন্তু নিয়ে আসতেন লন্ডন চিড়িয়াখানার জন্য। ওয়াল্টার তাঁর নিজের জমানো টাকা দিয়ে ক্যাঙ্গারু কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

“হয়ত এইভাবেই ওর সব লজ্জা কেটে যাবে, আর ও কথা বলতে পারবে।“ ওয়াল্টারের মা তাঁর বাবার কাছে ক্যাঙ্গারু কেনার জন্য অনুরোধ করলেন। ওয়াল্টারের বাবা রাজীও হলেন।

তাঁদের এস্টেট পার্কে কিছুদিনের মধ্যেই বহু ক্যাঙ্গারু ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাদের যিনি পরিচর্যা করতেন ওয়াল্টার তাঁর সাথে ওদের খেয়াল রাখতেন। তাঁর বাবা মা অত লক্ষ্যও করতেন না কখন সেখানে ওয়াল্টার এক ওয়ালাবি আনলেন আর কিভাবে তিনি কিউইদের সাথে সারা এস্টেট দৌড় করে বেড়াতেন। ওয়াল্টার এই উড়তে না জানা পাখীগুলোকে খুব ভালবাসতেন।
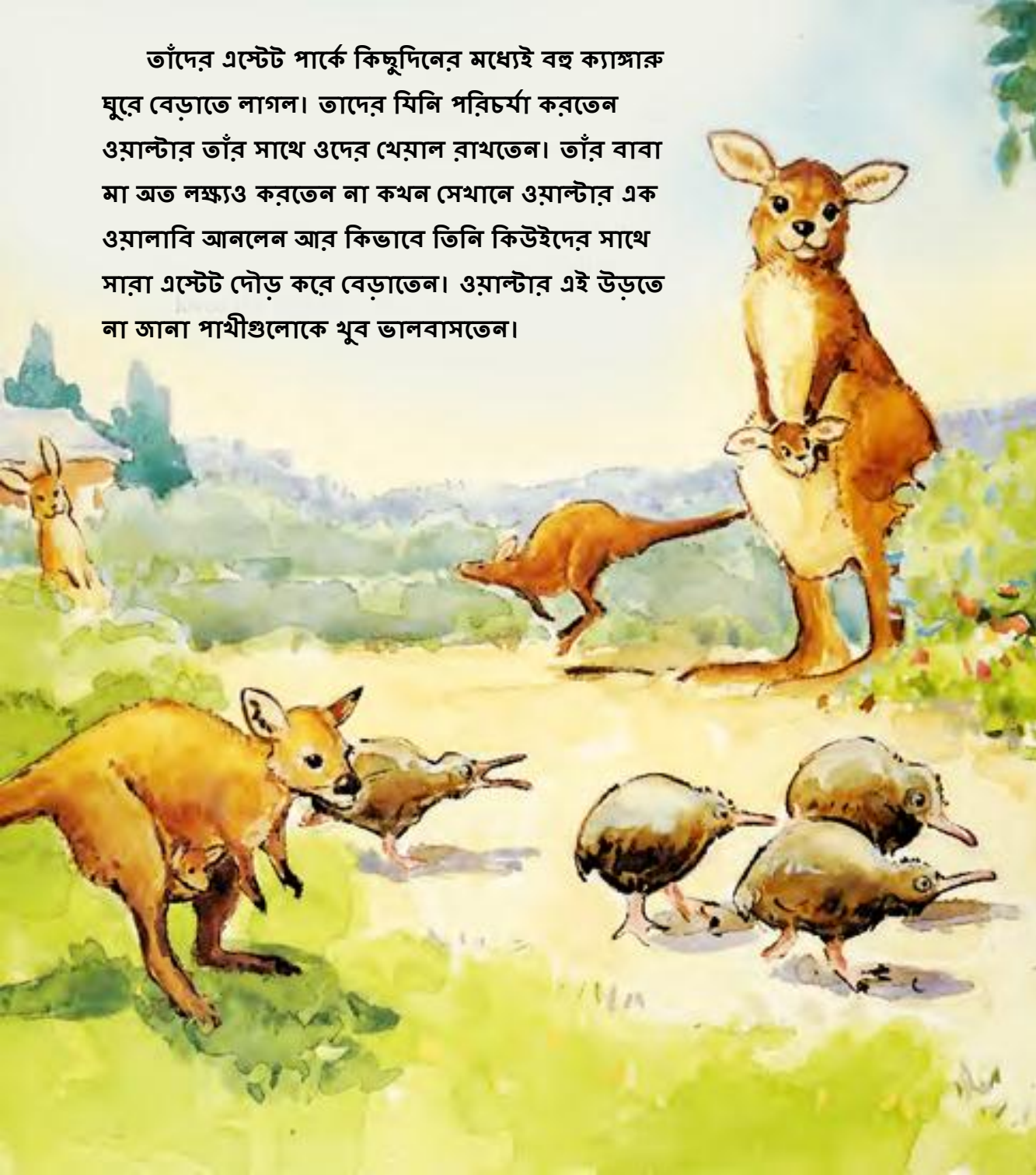
কিন্তু তাঁর মা খুব চটে গেলেন যেদিন এক বিরাট গোসাপ খাঁচা থেকে পালিয়ে তাঁর সাধের লিলি ফুলগুলো সব খেয়ে ফেলল।

"ওয়াল্টার!" তিনি চেঁচিয়ে ডাকলেন।
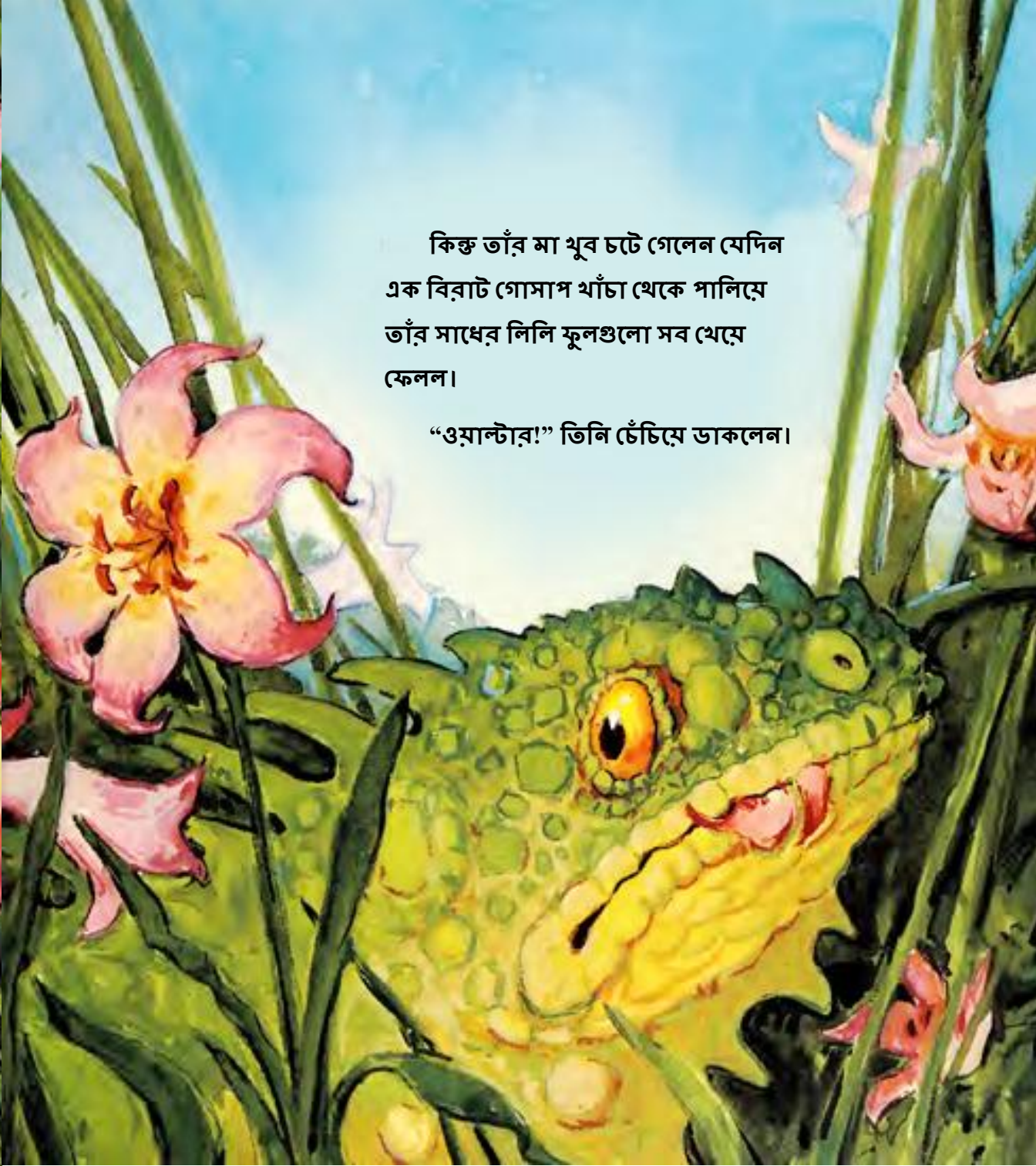
যখন ওয়াল্টারের বয়স বারো বছর হল, জাতীয় ইতিহাস সংগ্রহালয় লন্ডনে তাদের এক বিশাল সুন্দর ভবন নির্মাণ করলেন। ওয়াল্টার তখন ভাবলেন তাঁর সংগ্রহ যা এতদিন তাঁর বাগানের ছায়ায় রাখা ছিল তা ঐ প্রাসাদে স্থান পাবে। তিনি তাঁর কিছু সঞ্চয় করে রাখা ভ্রমর আল্বার্ট গুন্টারকে দেখালেন যিনি মিউজিয়ামের জ্যুলজি বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন। আল্বার্ট ওয়াল্টারের এই জীবজন্তুর প্রতি উৎসাহ দেখে সাথে সাথে ওয়াল্টারের গভীর বন্ধু ও পরামর্শদাতা হয়ে উঠলেন।

এ হল সেই সময়ের কথা যখন অনেক প্রাণীই আমাদের ও বিজ্ঞানীদের অচেনা ছিল। দূরের জঙ্গল আর অনেক দ্বীপ মানুষের পরিচিতির বাইরে ছিল। ওয়াল্টার সব অজানা দেশের অচেনা কীট পতঙ্গ, পাখী, আর প্রাণী খুঁজে পৃথিবীর সামনে আনতে চেয়েছিলেন। আল্বার্ট জানতেন ওয়াল্টার অন্যদের চেয়ে একদম আলাদা ছিলেন, তিনি কথা বলতে পারতেন না বলে নয়, তাঁর চিন্তার অনবদ্যতার জন্য।

ওয়াল্টারের বাবা তাঁর সেই উজ্জ্বলতা দেখতে পেতেন না। ওয়াল্টার যুবক হওয়ার সাথে সাথে তাঁর বাবা চাইলেন তিনি পোকামাকড়ের সঙ্গ ত্যাগ করে তাঁদের পারিবারিক ব্যাঙ্কের কাজে যোগ দিন।

ওয়াল্টার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের পরিবারের ব্যবসায় যোগ দিলেন। তাঁর মনে হতে লাগল স্বপ্নগুলো থেকে যেন অনেক দূরে সরে যাচ্ছেন।

ওয়াল্টারের মিউজিউয়াম বানানোর অদম্য ইচ্ছায় এর জন্য ঘাটতি পড়ল না। এখন তিনি নিজে আয় করতেন বলে নিজে এক অভিযান চালানোর জন্য অর্থ ঢালতে পারলেন যার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন অজানা প্রান্ত থেকে অদেখা প্রানীদের আবিস্কার করে আনা। তিনি এক সামুদ্রিক অভিযানের আয়োজন করলেন আর অনেক অনুসন্ধানকারীদের একত্রিত করলেন যাঁরা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অজানা অচেনা দ্বীপ থেকে সব অজানা পাখীদের সংগ্রহ করে আনবেন।

তাঁর বাবা তাঁকে চাকরি ছাড়তে দিতেন না, তাই ওয়াল্টার যতবার অনুসন্ধানকারীদের পাঠানো নতুন নতুন নমুনার বাক্সগুলো খুলতেন ততবার যেন মানসভ্রমন করে সেইসব অচেনা দ্বীপে পৌঁছে যেতেন।

ওয়াল্টার সেইসব পাখীদের সংরক্ষণ করার কৌশল শিখেছিলেন। তিনি নতুন নতুন সব পাখীদের সন্ধান পেয়েছিলেন যা এতদিন জানা ছিল না। বিজ্ঞান সমাজে তাঁর সংগ্রহ করা নতুন নমুনাগুলো বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করতে লাগল।

অবশেষে, তাঁর বাবা এক আপোষের রাস্তা বের করলেন। ওয়াল্টার ব্যাঙ্কের কাজ করতে থাকবে, আর তাঁর বাবা তাঁদের এস্টেটেই একখন্ড জমিতে ওয়াল্টারকে সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠা করতে দেবেন।

ওয়াল্টার আরও দ্বিগুণ উদ্যমে আরও অভিযানের জন্য টাকা ঢালতে লাগলেন। আর এস্টেটে আরো নতুন নতুন পাখী, আর নানান জাতীয় জীব জন্তু আসতে লাগল পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে। ওয়াল্টার এই নতুন আবিষ্কার নিয়ে লিখতে শুরু করলেন আর পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের এই নতুন জীব জন্তু নিয়ে গবেষণার জন্য আমন্ত্রণ করলেন। তাঁর এই আবিষ্কার জীব জন্তুদের নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল। তাঁর চব্বিশ বছরের জন্মদিনের কিছুদিনের মধ্যেই এই সংগ্রহালয়ের কাজ সম্পূর্ণ হল।

অবশেষে সেই দিনটি এল। ওয়াল্টার পৃথিবীর সামনে তাঁর সংগ্রহালয়ের দ্বারোন্মোচন করলেন– অচেনা অজানা জীবেদের এক অদ্ভুত দুনিয়ার দ্বার খুলে দিলেন জগতের সবার জন্য।

কঙ্গোর ওকেপি, কলাম্বিয়ার কাপিবারাস, আর মারাবউর সারস দেখতে সকাল থেকেই ভিড় জমে যেত। লোকেরা অবাক হয়ে দানবিক কাসোয়ারি, কাঁটাওয়ালা পিপিলিকাভুক, আর প্রাগৈতিহাসিক জন্তুদের ফসিল দেখত।
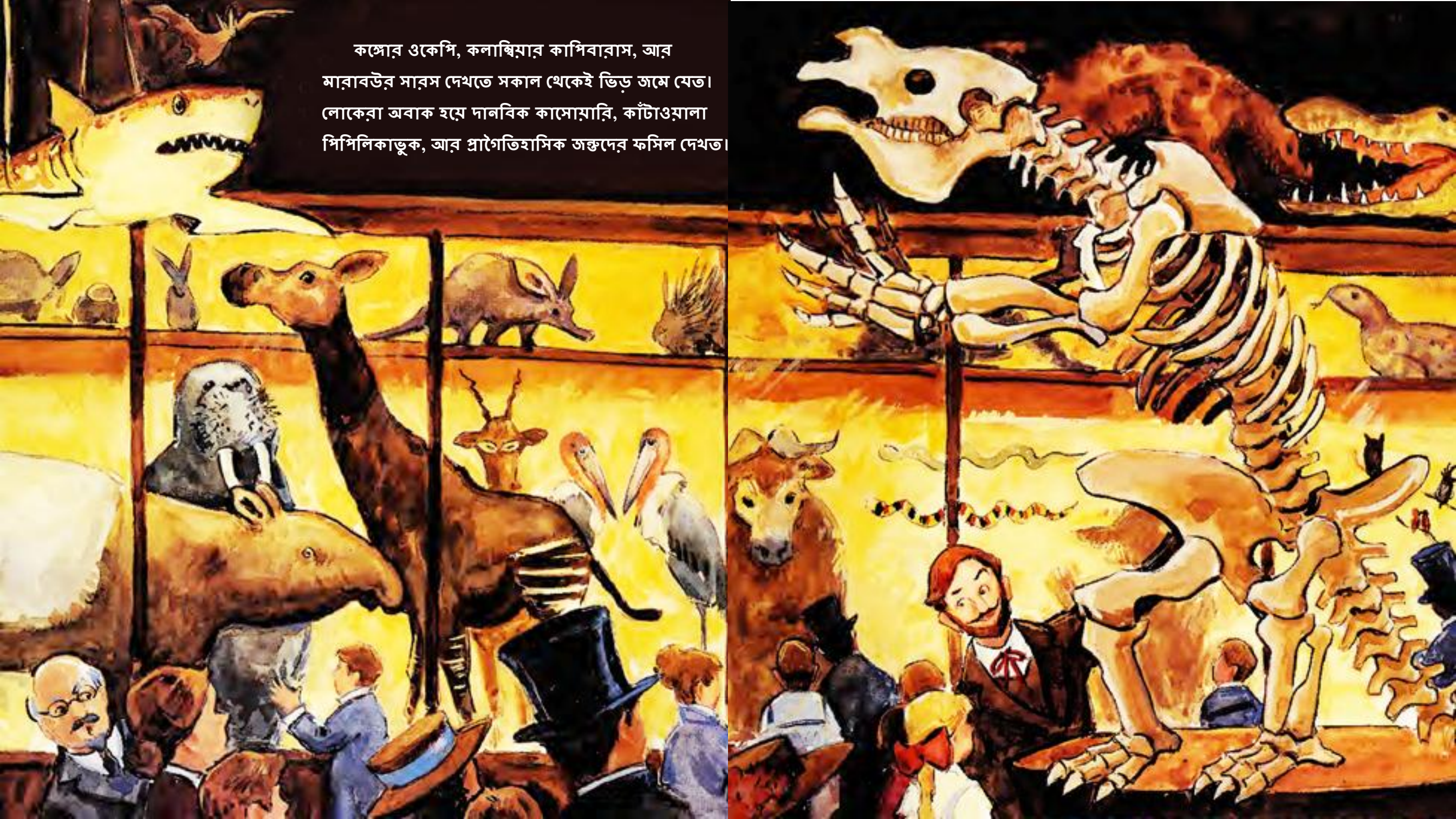
ওয়াল্টারের এই জীব জন্তুদের সংগ্রহালয় কারোর একার চেষ্টায় করা পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ সংগ্রহালয়। এর জন্য তিনি বিজ্ঞানের জগতে অনেক সম্মান পেয়েছিলেন। তাঁর দুই সহকর্মীর সহায়তায় তিনি বারো শ বই ও বৈজ্ঞানিক পত্রিকা লিখে গেছেন। এছাড়াও তিনি বহু নতুন জীবের নামকরণ করে গেছেন। নামের সাথে রথশিল্ড যুক্ত আছে এমন পাঁচ হাজার প্রজাপতি, মাছ, কেন্নো, মাছি, টিকটিকি, সজারু, ওয়ালাবি, পাখী এবং জিরাফ আজকের দুনিয়ায় রয়েছে।

ওয়াল্টার কোনদিন ভাল ব্যাঙ্কার হতে পারেন নি। তিনি সারা জীবন একা কাটিয়েছেন, বিয়ে না করে। তিনি তাঁর চারপাশে সর্বদা বিশাল কচ্ছপ, কাসয়ারি, এবং অন্য নানান রকমের জীবজন্তুদের নিয়ে থাকতেই ভালবাসতেন।
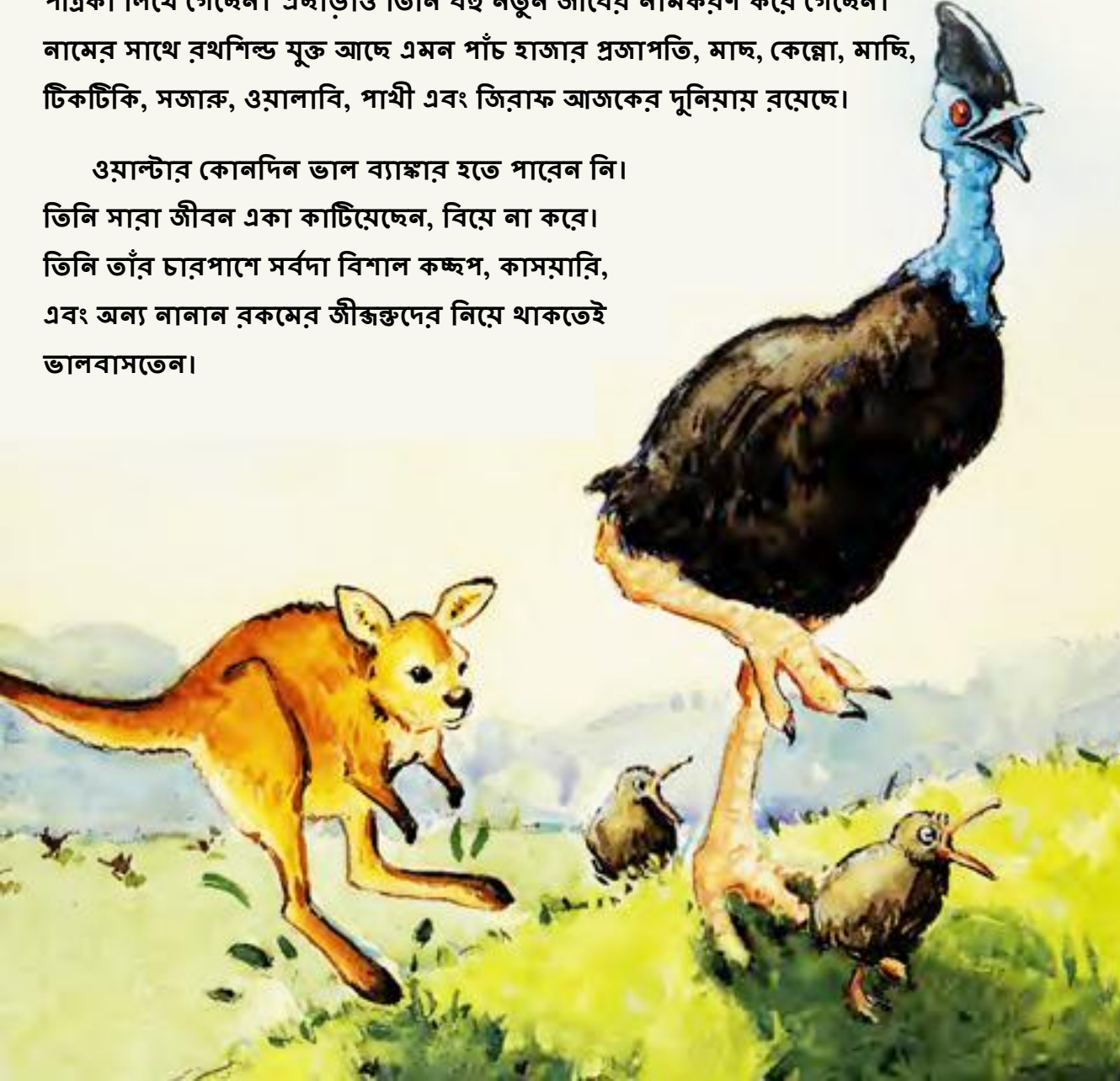
অবশেষে তাঁকে লর্ড রথশিল্ড উপাধি দেওয়া হল। তাঁর মিউজিয়াম যাঁরা দেখতে আসতেন তাঁদের সাথে ওয়াল্টারের উদার ব্যবহার সবার কাছে তাঁকে অত্যন্ত প্রিয় মানুষ করে তুলেছিল।
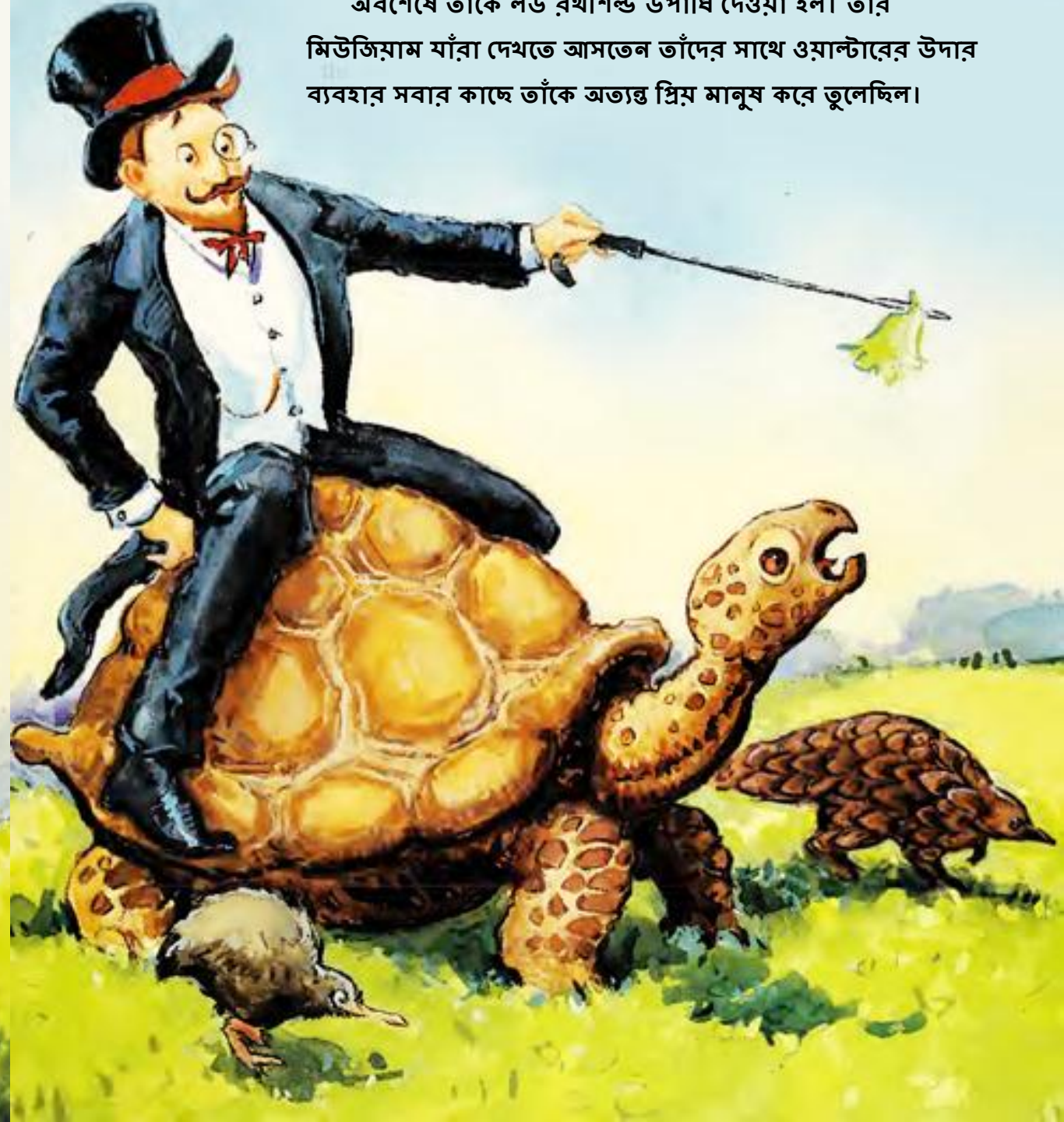
কিন্তু তাঁর উদারতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল তিনি তার সংগ্রহ ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীদের জন্য খুলে দিয়েছিলেন, যা পরবর্তিকালে জীব জগতের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আমাদের ধারনাই পাল্টে দেয়।

লেখকের নোট

লিওনেল ওয়াল্টার রথশিল্ড (১৮৬৮ –১৯৩৭) জীব বিজ্ঞানে তাঁর অবদান ও প্রানীদের নিয়ে তাঁর উৎসাহর জন্য বিখ্যাত ছিলেন। লর্ড হিসেবে, ওয়াল্টার জেব্রা টানা গাড়ীতে চেপে পিকাডেলি লেন দিয়ে ঘুরতে ভালবাসতেন, যেখানে তিনি ছোট্ট বয়সে সার্কাস প্যারেড দেখেছিলেন।

তাঁর বাবা, লর্ড নাথান রথশিল্ড, ইংল্যান্ডের প্রথম জিউ এবং রানী ভিক্টোরিয়ার ব্যাঙ্কার ছিলেন। যা শোনা যায়, ছেলের কথা বলার অক্ষমতা ও লাজুক স্বভাব নিয়ে নাথান রথশিল্ড খুবই হতাশ ও বিমর্শ থাকতেন। পরিবারের বড় ছেলে হিসেবে, ওয়াল্টারের উপরই ব্যাঙ্কিং ব্যাবসা সামলানোর ভার এসে পড়েছিল যা ওয়াল্টারের জন্য খুব সহজ ছিল না। ভরপুর আবেগ আর সাহসিকতার সাথে ওয়াল্টার তাঁর নিজস্ব প্রানী সংগ্রহালয় তৈরি করলেন, মাত্র ৭ বছর বয়সে। আজ এত বছর পরেও মানুষ উৎসাহের সঙ্গে ইউনাইটেড কিংডমের হেরটফর্ডশায়ারের ট্রিঙ্গে, ওয়াল্টারের বানানো ন্যাশানাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের প্রতিটা কোণা একই ভাবে উপভোগ করে।

আমি ওয়াল্টারকে প্রথমবার দেখেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছিলাম, কিছুটা হয়ত আমিও ছোট থেকেই বন্য জীব জন্তুদের ঘেরা পরিবেশে বড় হয়েছি তাই। আমার পিতামহ এবং পিতামহী পক্ষীবিদ ছিলেন, এবং তাদের বাড়ি ভর্তি নানান রকমের পাখী ছিল। যখনই সুযোগ পেতাম আহত পেঁচা বা ঈগলকে সেবা শুশ্রূষা করতাম। তাঁদের বাড়িতে অনেক বিজ্ঞানীরা আসতেন এবং তাঁরাও আহত বা অসুস্থ পাখীদের সুস্থ হতে সাহায্য করতেন। তাঁদের মধ্যেই একজন ছিলেন স্বনামধন্য আরনেস্ট মাইর, যিনি তাঁর জীবিকা শুরু করেন ওয়াল্টারের জন্য পাপুয়া নিউ গিনি অভিযান দিয়ে। সেখান থেকে ওয়াল্টারের জন্য নানান নমুনা সংগ্রহ করে আনেন যা এখন নিউ ইয়র্কের আমেরিকান ন্যাশানাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

ওয়াল্টার সেই সময়ে জন্মেছিলেন যখন দূরদূরান্তে যাওয়া এত সহজ ছিল না। তখন প্রানীদের উপর কোন ছায়াছবি বা খুব ভাল স্থিরচিত্রও পাওয়া যেত না। প্রানীদের নমুনা সংগ্রহ করেই বিজ্ঞানীদের তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হত।

বন্য পশুদের সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান ধারনা এখন অনেক বদলে গেছে। প্রানীদের নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করা এখন নীতিবিরুদ্ধ। আমরা এখন বন্য প্রানীদের বাইনোকুলার দিয়ে দেখে তাদের দেহগত বৈশিষ্ট আর ক্যামেরার সাহায্যে ভিডিও তুলে তাদের ব্যবহারিক চরিত্র অধ্যয়ন করি। বিজ্ঞানীরা পাখীদের ধরে তাদের পায়ে নম্বর লেখা ব্যান্ড বেঁধে দেন, তারপর তাদের কোন ক্ষতি না করে বনে ছেড়ে দেন।

যদিও আজকের দিনের জীব অধ্যয়নের পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে আলাদা তবুও আজও বিজ্ঞানীরা এবং মিউজিয়ামের দর্শনার্থীরা ওয়াল্টারের সংগ্রহ দেখে অনেক জ্ঞানার্জন করতে পারেন।